International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-IV, July 2022, Page No.
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i4.2022.

প্রসঙ্গ জৈন নীতিতত্ত্ব : একটি সমীক্ষা

Dr. Debabrata Saha
Associate Professor of Philosophy, Kazi Nazrul University, Asansol, West-Bengal

Abstract:
Though Jaina philosophy is considered non-Vedic school of Indian philosophy, but it is clearly integrated with Vedic thought. The essence of Jaina philosophy is its ethics. Hence the knowledge of saptatattva in Jaina philosophy elaborates Jaina ethics. The saptatattva are Jiva, Ajiva, Bandha, Sambara, Nirjara and Moksa. As long as there is a discussion of ethics in the heart of this world, Jaina ethics will have its place. In this research article I have tried to highlight the Jaina school of Indian Philosophy in the light of its ethical thought.

ভারতীয় দর্শনচর্চায় জৈন দর্শন অবৈদিক-রূপে গণ্য হলেও সমন্বিত বৈদিক চিন্তাধারা এই দর্শনে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। জৈন দর্শনের সার হল তার নীতিতত্ত্ব। ভারতীয় নীতিতত্ত্ব মাত্রেই জীবের বন্ধন-মুক্তির উপযোগী নৈতিক আচরণ-নিয়ন্ত্রক কর্তব্যের দিগদর্শন। আবার এরূপ দিগদর্শন মোক্ষার্থীর জগৎ-চেতনা নির্ভর। জৈন দর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে জৈন নীতিতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হল জীবের বন্ধন-মুক্তির উপযোগী নৈতিক আচরণ-নিয়ন্ত্রক কর্তব্যের দিগদর্শন প্রদান। তাই জৈন দর্শনে সপ্ততত্ত্বের জ্ঞান জৈন নীতিতত্ত্বকে পরিস্ফূট করে। সপ্ততত্ত্বগুলি হল জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা এবং মোক্ষ।

জীব ও অজীব: জৈন মতে জীব প্রথম তত্ত্ব এবং অজীব দ্বিতীয় তত্ত্ব। জৈনগণ বলেন সমগ্র বিশ্ব জীব ও অজীব এই দুটি পদার্থ দ্বারা গঠিত। জৈন দর্শন অনুযায়ী জীব বলতে বোঝায় যার চৈতন্য আছে,[1] তাঁরা বলেন যেকোন চেতন দ্রব্য সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন বা তার চেতনা যত স্বল্পই হোক না কেন তা জীব পদবাচ্য। জীব কখনো চেতনা হীন হয় না। জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। জীব যেমন অন্যকে প্রকাশ করে, তেমনি নিজেকেও প্রকাশ করে।

জীবের প্রকারভেদ: জীবকে প্রথমত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে – ১) সংসারী জীব এবং ২) মুক্ত জীব বা সিদ্ধ জীব।[2]

সংসারী জীব : সংসারী জীব সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পরিভ্রমণরত। এই পরিভ্রমণের আদি নেই, তবে অন্ত আছে। জীব মুক্ত হলে এই পরিভ্রমণ সমাপ্ত হয়।

মুক্ত জীব বা সিদ্ধ জীব : মুক্ত জীব তাঁরাই যাঁরা কার্মিক পদার্থকে ক্ষয় করে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন।

সংসারী জীবকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, ত্রস এবং স্থাবর।[3] ত্রস জীব গতিশীল অর্থাৎ একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে পারে। আর স্থাবর জীব গতিহীন অর্থাৎ একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে পারে না। স্থাবর জীব একেন্দ্রিয় বিশিষ্ট। এদের কেবলমাত্র স্পর্শ অনুভূতি আছে এবং এদের চেতনা সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরীয়। ত্রস জীবকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, ১) বিকলেন্দ্রিয় এবং ২) সকলেন্দ্রিয়। দ্বীন্দ্রিয় থেকে চতুরিন্দ্রিয় জীবকে বলা হয় বিকলেন্দ্রিয় জীব এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবকে বলা হয় সকলেন্দ্রিয় জীব।

জৈন দর্শনে যাকে জীব বলা হয়, অপরাপর দর্শনে তা আত্মা রূপে কথিত। আধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিকদের মতে আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা। আত্মা উৎপত্তি ও বিনাশহীন। কিন্তু চার্বাক সম্প্রদায় এই মতের বিরোধীতা করে বলেন, আত্মা হল চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ। যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ চৈতন্য থাকে, দেহ বিনিষ্ট হলে চৈতন্য আর থাকে না। আবার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে, বিজ্ঞান বা চৈতন্যের প্রবাহই আত্মা। পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান প্রবাহ ছাড়া আত্মা বলে পৃথক কোন সত্তা নেই।

জৈন মতানুসারে অজীবও জীবের মতই সৎ। জৈনরা জীবের যে লক্ষণ দিয়েছেন অজীব তার বিপরীত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ অজীব হল চেতনাশূন্য জড়। অজীব পাঁচ প্রকার। যথা, ১) ধর্ম, ২) অধর্ম, ৩) আকাশ, ৪) পুদ্গল এবং ৫) কাল। ধর্ম, অধর্ম, আকাশ এবং কাল অরূপী অজীব আর পুদ্গল রূপী অজীব। যার আকার আছে তা রূপী এবং যার আকার নেই তা অরূপী।

জৈন মতে ধর্ম হল এমন একটি দ্রব্য যা জীব ও পুদ্গলের গতিতে সহায়তা করে। অর্থাৎ এই দ্রব্য না থাকলে জীব বা জড় পদার্থের পক্ষে গতিবান হওয়া সম্ভব হতো না। এজন্য ধর্মকে গতি সহায়ক বলে। ধর্ম গতি সহায়ক মাত্র, কিন্তু গতির প্রযোজক নয়। অর্থাৎ গতিহীন বস্তুকে গতিশীল করার সামর্থ্য ধর্মের নেই।

আর অধর্ম এমন একটি দ্রব্য যা জীব ও জড় পদার্থকে স্থির থাকতে সাহায্য করে। অর্থাৎ ধর্ম যেমন গতির সহায়ক, অধর্ম স্থিতির সহায়ক।[4] ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ এবং গুণ বর্জিত।[5] ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই অরূপী। ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই গতিহীন এবং এরা উভয়েই এক একটি সমগ্র দ্রব্য।[6]

আর আকাশ হল বিস্তারযুক্ত অজীব দ্রব্য। আকাশ এমন একটি জড় দ্রব্য যা জীব, পুদ্গল প্রভৃতি অন্যান্য সকল পদার্থকে অবস্থিতি দান করে। যেমন, একটি প্রদীপের দীপ শীখাকে স্থান করে দেয় আকাশ। আবার দেওয়ালে পেরেক পোঁতা হলে সেই পেরেককে স্থান করে দেয় আকাশ। তেমনি আকাশ জীব এবং অজীবকে স্থান দেয়।[7] তাই বলা যায়, এমন কিছু নেই যা আকাশে অবস্থান করে না। এটি সর্বত্র বিরাজমান। আকাশ ধর্ম ও অধর্মের মতো স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণগুণ বর্জিত।

আর অজীব বস্তু সমূহের মধ্যে একমাত্র পুদ্গল হল রূপী অজীব। যে দ্রব্য সংযোগ ও বিভাগযোগ্য (পুরয়ন্তি গলন্তি চ) তাই পুদ্গল।[8] পুদ্গলের দুটি রূপ – অণু এবং স্কন্ধ।[9] একটি জড় দ্রব্যকে ক্রমান্বয়ে বিভাগ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় অণু। একাধিক অণুর সমন্বয়ে উৎপন্ন হয় সংঘাত বা স্কন্ধ। ঘট, পটাদির ন্যায় সকল স্থূল দ্রব্য হল সংঘাত বা স্কন্ধ। জৈন মতে, আমাদের দেহ, মন, বাক্ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস পুদ্গল দ্বারাই সৃষ্ট।[10] তাঁদের মতে, পুদ্গলের কারণেই জীবের সুখ, দুঃখ, জন্ম এবং মৃত্যু হয়।[11]

আস্রব: আস্রব শব্দের অর্থ পীড়া, কষ্ট, দুঃখ। এখানে 'আস্রব' শব্দটি পারিভাষিক, যার অর্থ জীবের কর্মের আগমন পথ। পথ বা দ্বার (দরজা) বিনা কোন বস্তু কোথাও প্রবেশ করতে পারে না। তত্ত্বার্থসূত্রানুযায়ী কায়, বাক্য ও মনের কর্ম হল 'যোগ'।[12] আর এগুলিই আস্রবের কারণ।[13] অর্থাৎ দৈহিক, বাচিক এবং মানসিক কর্মই আস্রবের কারণ। জলের নিম্নে অবস্থিত কোন দ্বার থাকলে তার মধ্যে দিয়ে জল প্রবাহিত হয় বলে

তাকে আস্রব বলে। সেরূপ কর্মের দ্বার পথে কর্মস্রোত প্রবেশ করে জীবের সাথে সংযুক্ত হয় বলে কর্মের গতি বা যোগকে আস্রব বলা হয়। জলে সিক্ত বস্ত্র যেমন সমস্ত অংশের দ্বারা বায়ু বাহিত ধূলিকণাকে গ্রহণ করে সেরূপ কষায় রূপ জলে সিক্ত জীব যোগ বা আস্রবের দ্বারা আনীত কর্মকে সকল অবয়বের দ্বারা গ্রহণ করে। অথবা নিঃশেষে উত্তপ্ত লৌহপিন্ড জলে ফেলা হলে যেরূপ সকল অবয়বের দ্বারা জল কণাকে শোষণ করে সেরূপ কষায়ের দ্বারা উষ্ণ জীব যোগ বা আস্রবের দ্বারা আনীত কর্মসমূহকে সকল দিক থেকে গ্রহণ করে।

কষায়ের দ্বারা চালিত কর্মসমূহের ফলে 'সাম্পরায়িক' (দীর্ঘমেয়াদী) আস্রব সংঘটিত হয়। আবার কোন ব্যক্তি কষায় মুক্ত হয়ে কর্মসম্পাদন করলে ঈর্ষাপথ (স্বল্পমেয়াদী) আস্রব হয়।

যে কোন কষায় যুক্ত কর্ম সাম্পরায়িক কর্মাস্রবের কারণ হয়। সাম্পরায়িক কর্মাস্রবের অধিকরণ জীবও হতে পারে আবার অজীবও হতে পারে। এই প্রকার আস্রবের জীবাধিকরণ হল আত্মা এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। সাম্পরায়িক কর্মাস্রবের অজীব অধিকরণ হল শরীর এবং কর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম।

শুভ কর্ম সমূহ শুভ কর্মাস্রবের কারণ। পূজ্যপাদের মতে, কর্মের প্রকৃতি শুভ না অশুভ তা নির্ভর করে ব্যক্তির শুভাশুভ অভিপ্রায়ের উপর।[14] আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, শুধুমাত্র অশুভ কর্মই পরিত্যাজ্য, কারণ তা পরিণামে দুঃখ ডেকে আনে। বাস্তব দৃষ্টভঙ্গি থেকে অশুভ কর্মের তুলনায় শুভ কর্ম অবশ্যই কাম্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টভঙ্গি থেকে শুভ কর্মকেও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কারণ অশুভ কর্মের ন্যায় শুভ কর্ম পরিণামে জীবকে বদ্ধ করে।

বন্ধ: জীব নিজ কর্ম অনুসারেই পুদগ্‌ল কণাকে আকৃষ্ট করে। আর এই আকৃষ্ট পুদগ্‌লকে কর্মপুদগ্‌ল বলে। আস্রব জীবের স্বরূপ নষ্ট করে বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়। যখন এই পুদগ্‌ল কণা জীবে প্রবিষ্ট হয় তখন সেই অবস্থাকে বন্ধন বলে। বন্ধন দুই প্রকার – ভাববন্ধ এবং দ্রব্য বন্ধ। মনে দূষিত বিচার করাকে ভাববন্ধ বলে। আর যখন পুদগ্‌ল কণা জীবে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই বন্ধনকে দ্রব্যবন্ধ বলে। যেভাবে দুধ ও জলের মিশ্রণ হয় সেভাবে আত্মা ও পুদগ্‌লের সংযোগ হয়। এই সংযোগ বা মিলনকে দ্রব্যবন্ধ বলে। ভাববন্ধ হল দ্রব্যবন্ধের কারণ। ভাববন্ধের পর দ্রব্যবন্ধের আবির্ভাব হয়।

কর্মপুদগ্‌ল জীবাত্মাকে চার প্রকারে বন্ধ করে। এই প্রকার গুলি হল ১) প্রকৃতি বন্ধ, ২) স্থিতি বন্ধ, ৩) অনুভব বন্ধ এবং ৪) প্রদেশ বন্ধ।

প্রকৃতি বন্ধ : কর্মপুদগ্‌ল জীবাত্মার সঙ্গে বদ্ধ হবার সময়, যোগের শুভাশুভতা, তীব্রতা, মন্দতা প্রভৃতি কারণের দ্বারা বিশেষ বিশেষ প্রকারের পরিণতি ও আত্মার বিশেষ বিশেষ গুণকে আবৃত করার স্বভাব নিয়ে বদ্ধ হয়। এই রূপ বন্ধকে প্রকৃতি বন্ধ বলে।

স্থিতি বন্ধ : কর্মপুদগ্‌ল জীবের সঙ্গে বদ্ধ হবার সময়, রাগ-দ্বেষাদির তীব্রতা বা মন্দতার জন্য বিস্তৃত বা অল্প সময়ের স্থিতি নিয়ে বদ্ধ হয় একে স্থিতি বন্ধ বলে।

অনুভাব বন্ধ : রাগ-দ্বেষাদির অধ্যাবসায়ের তারতম্যের প্রভাবে কর্মপুদগ্‌ল শুভ কি অশুভ, তীব্র কি মন্দ ইত্যাদি কেমন ফল প্রদান করবে, তা বন্ধের সময় নিশ্চিত হয়। এরূপ ফলপ্রদান করার শক্তি রূপ রসযুক্ত হয়ে যে বন্ধ হয় তাকে অনুভাব বন্ধ বা রসবন্ধ বলে। বন্ধের তীব্রতা বা গুণের উপর এই বন্ধ নির্ভর করে।

প্রদেশ বন্ধ : কর্মরূপে পরিণত পুদগ্‌লের দ্ব্যণুকাদিক্রমে যে স্কন্ধ বা সংঘাত যা অনন্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত, জীবায়বের বিভিন্ন প্রদেশে তার অনুপ্রবেশকে প্রদেশ বন্ধ বলে। মন-বচন কায়ার প্রভাবে যখন কর্মপুদগ্‌ল জীবের সঙ্গে বদ্ধ হবার জন্য আকৃষ্ট হয়ে আসে, তখন তা যোগের তারতম্যের জন্য কখনো অধিক বা

কখনো অল্প সংখ্যায় আগত হয়ে আত্মার সহিত বদ্ধ হয়। এই রূপ অল্প বা বহু পরিমাণ বিশিষ্ট বন্ধকে প্রদেশ বলে।

সংবর: তত্ত্বার্থসূত্রানুযায়ী পঞ্চম তত্ত্ব হল সংবর। যে সমস্ত কার্যের দ্বারা কর্মের আস্রব অর্থাৎ অগমনকে নিরোধ করা যায়, তাই সংবর। এটি আস্রবের বিপরীত তত্ত্ব। জৈন পরিভাষায় 'আস্রব' হল জীবের চলন। আস্রবের নিরোধ কর্মপুদ্গল গুলি জীবে প্রবেশ করে না। তাই আস্রব নিরোধকে সংবর বলা হয়। তত্ত্বার্থসূত্রানুসারে গুপ্তি, সমিতি, যতিধর্ম, অনুপ্রেক্ষা, পরীষহজয় এবং চারিত্র দ্বারা আস্রব রুদ্ধ হয় তথা সংবর সাধিত হয়। এগুলি মূলতঃ শ্রমণদের চর্চা ও চর্যাভিত্তিক।

গুপ্তি : যে আস্রব বা যোগের দ্বারা কর্মপুদ্গল জীবে প্রবেশ করে তা থেকে জীবকে রক্ষা করা হল গুপ্তি। উত্তরাধ্যায়নসূত্রানুসারে যে কোন পাপের নিবারক হল গুপ্তি। গুপ্তি তিন প্রকার – ১) মনো গুপ্তি, ২) বাগ্ গুপ্তি এবং ৩) কায় গুপ্তি।

সমিতি : প্রাণী পীড়া পরিত্যাগ করে সম্যগ্ভাবে অবস্থান হল সমিতি। সমিতি পাঁচ প্রকারের। উত্তরাধ্যায়নসূত্রানুযায়ী ধর্মীয় জীবন-যাপনের জন্য পঞ্চ-সমিতির প্রয়োজন। এই পঞ্চ সমিতি হল – ঈর্ষা সমিতি, ভাষা সমিতি, এষণা সমিতি, আদান সমিতি এবং উৎসর্গ সমিতি।

যতিধর্ম : একজন শ্রমণের ক্ষেত্রে দশটি প্রধান নৈতিক গুণের অনুশীলন আব্যশক। এগুলিকে বলা হয় যতিধর্ম। এগুলি হল – ক্ষমা, মার্দব, আর্জব, শৌচ, সত্য, সংযম, তপস্, ত্যাগ, আকিঞ্চন্য এবং ব্রহ্মচর্য। এই দশটি ধর্মের পালন সংবরের তৃতীয় উপায়।

অনুপ্রেক্ষা : সংবরের অন্যতম উপায় হল অনুপ্রেক্ষা। অনুপ্রেক্ষা হল কতকগুলি ভাবনা। তত্ত্বার্থসূত্রে ১২ টি অনুপ্রেক্ষার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল – অনিত্য ভাবনা, অশরণ ভাবনা, সংসার ভাবনা, একত্ব ভাবনা, অন্যত্ব ভাবনা, অশুচিত্ব ভাবনা, আস্রব ভাবনা, সংবর ভাবনা, নির্জরা ভাবনা, লোক ভাবনা, বোধিদুর্লভ ভাবনা এবং ধর্ম ভাবনা।[15]

পরীষহ : পরীষহ হল কষ্ট বা কষ্টকর বিষয়। শ্রমণগণ এই কষ্ট অনাসক্তি এবং তিতিক্ষার দ্বারা জয় করবেন। সধারণভাবে মোক্ষকামীকে আলস্য এবং স্বাচ্ছন্দের জীবন পরিত্যাগ করতে হয় এবং কষ্টকে বরণ করে নিতে হয়। তত্ত্বার্থসূত্রে এবং উত্তরাধ্যায়নসূত্রে বাইশটি পরীষহের উল্লেখ রয়েছে। এগুলি হল – ক্ষুত পরীষহ, পিপাসা পরীষহ, শীত পরীষহ, উষ্ণ পরীষহ, দংশমসক পরীষহ, নাগ্ন্য পরীষহ, অরতি পরীষহ, স্ত্রী পরীষহ, চর্যা পরীষহ, নিষদ্যা পরীষহ, শয্যা পরীষহ, আক্রোশ পরীষহ, বধ্য পরীষহ, যাচনা পরীষহ, অলাভ পরীষহ, রোগ পরীষহ, তৃণস্পর্শ পরীষহ, মল পরীষহ, সৎকার পুরস্কার পরীষহ, প্রজ্ঞা পরীষহ, অজ্ঞান পরীষহ এবং অদর্শন পরীষহ। এই বাইশটি পরীষহ জয় করলে আস্রব প্রতিহত হয় এবং সংবর সাধিত হয়।

নির্জরা: নির্জরা জৈনমতে ষষ্ঠতত্ত্ব। নির্জরার অর্থ কর্মবন্ধনের ক্ষয়। তপঃ দ্বারা কর্মবন্ধনের ক্ষয় হয়। নির্জরা হল দুই প্রকার, যথা, ভাব নির্জরা এবং দ্রব্য নির্জরা। কামনার পূর্ত্তি সাধন করে কর্মের ক্ষয়কালীন নির্জরাকে ভাব নির্জরা বলে। তারপর জীবে অবস্থিত কর্মপুদ্গলের প্রকৃত বিনাশ হল দ্রব্য নির্জরা। অন্যভাবেও নির্জরাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, যথাকাম নির্জরা এবং ঔপক্রমিক নির্জরা। যে কালে যে কর্ম ফলপ্রদান করার কথা, তা সেই ফলপ্রদান করে বিনষ্ট হলে তাকে যথাকাম নির্জরা বলে। এর জন্য কোন উদ্যোগ নিতে হয় না। আর, ঔপক্রমিক নির্জরা চেষ্টান্বিত। এই নির্জরার জন্য জীবকে সচেষ্ট হতে হয়।

মোক্ষ: জৈনমতে মোক্ষ সপ্তমতত্ত্ব। আত্মাকে কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত করাই হল মোক্ষ। অর্থাৎ সকল কর্মক্ষয় দ্বারা জীবাত্মার নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই হল মোক্ষ। জৈনদর্শনে মোক্ষ হল জীব থেকে কর্মপুদ্গলের বিযুক্তিকরণ। অর্থাৎ আত্মা থেকে যখন কর্মপুদ্গলের সম্পূর্ণ বিয়োগ ঘটে তখনই মক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

ভারতীয় দর্শনে জৈন দর্শন নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও নৈতিকতার যে আদর্শ সন্নিবেশিত হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য ও অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে যে, জৈন নীতিতত্ত্বে এমন কিছু নৈতিক ভাবনা স্থান পেয়েছে তা একদিক থেকে যেমন অনন্য তেমনই সময়োপযোগীও বটে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই অহিংসার কথা উল্লেখ করতে হয়। তবে এমন নয় যে, জৈনরা ছাড়া অহিংসার কথা কেউ বলেন নি, তথাপি অহিংসা সম্পর্কে জৈন মতবাদের স্বাতন্ত্র্য এই যে, যে উচ্চতায় এবং মাত্রায় জৈনরা এই নীতিটিকে স্থাপন করেছেন তা কোথাও পরিলক্ষিত হয় নি। ব্যক্তির নৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা সামাজিক জীবনে এবং আদর্শে— সর্বত্রই অহিংসার প্রতিফলন বাস্তবে অতি বিরল নিদর্শন। অহিংসাকে কেন্দ্র করে যে পঞ্চব্রতের কথা জৈন নীতিতত্ত্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটির গুরুত্ব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অপরিসীম।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো মনে হয় যে, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার ঘটনা, অপরের গোপন তথ্য প্রকাশের ঘটনা প্রভৃতি মানুষকে যেন নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের এই নৈতিক অবক্ষয় রোধ করার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় জৈনদের সত্যব্রত একটি যথার্থ নিদান। একইভাবে অস্তেয় ব্রতের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এই ব্রত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সর্বপ্রকার চৌর্যকে নিষিদ্ধ করে, যা বর্তমান যুগেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। আবার ব্রহ্মচর্য ব্রতটির গুরুত্বও বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপরিসীম। বর্তমান যুগে আধুনিকতার নামে যে উৎশৃঙ্খল জীবনযাপন শুরু হয়েছে তারও যথার্থ নিদান হতে পারে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন। এছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর যৌথ জীবন যাপনেও যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা থাকা আবশ্যক তা স্মরণ করিয়ে দেয় এই ব্রহ্মচর্য ব্রত। আবার অপরিগ্রহ ব্রতের দিকে তাকালে এই একই কথায় বলতে হয় যে, বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্রতটিও অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। অপরিগ্রহের অন্তর্নিহিত নির্যাসটি হল এই যে, মানুষ তার প্রয়োজনীয় বস্তুর ভোগের মধ্যেই যেন সন্তুষ্ট থাকে। বর্তমানে আমরা এমনই লোভের শিকার হই যে, আমরা আমাদের প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অধিকার করা থেকে যদি বিরত থাকি তবে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের আংশিক অবসান ঘটাতে পারি। এই ব্রত বাস্তবে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই ব্রতগুলির মধ্যে এই নির্দেশই করা হয়েছে যে, কেউ নিজে ব্রত লঙ্ঘন করবেন না, অপরকে তা করার নির্দেশও দেবেন না এবং ক্ষেত্রবিশেষে অপরের অন্যায় কাজকে অনুমোদনও করবেন না। অর্থাৎ নিজে কোন অন্যায় কাজ করা যেমন দোষণীয় তেমনি অপরকে তা নির্দেশ করা বা অপরের কোন অন্যায় কাজকে অনুমোদন করাও ততটাই দোষণীয়। অতি প্রাচীনকালে জৈনদের এই চুলচেরা বিচার আজকের যুগে কতটা প্রাসঙ্গিক তা ভাবলে আমাদের অবাক হতে হয়।

জৈন নীতিতত্ত্বে কষায়ের ধারণাটিও অনন্য। কেননা, কষায়কে সংযত করার মধ্য দিয়ে এক অনাসক্ত, নিরুদ্বিগ্ন, শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের সন্ধান পাওয়া যায়। বাস্তবিক জীবনে শান্তি পেতে হলে কষায়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

জৈন নীতিতত্ত্বে প্রায়শ্চিত্তের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা এই বক্তব্যই পরিস্ফুট হয় যে, অন্যায় বা অপরাধ করলে তা স্বীকার করার সৎ সাহস থাকা উচিত এবং সেই ভুল সংশোধন করে পুনরায় নৈতিকতার পথ অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়।

জৈন নীতিতত্ত্বে যে জীব তথা পরিবেশের ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে তা যুগোত্তীর্ণ এবং কালোত্তীর্ণ। আজ এই সমাজ পরিবেশ নিয়ে স্কুল, কলেজে যে সচেতনতার পাঠ বাধ্যতামূলক করেছেন তা জৈন আচার্যগণ আড়াই হাজার বছরেরও পূর্বে চিন্তা করে গেছেন। গাছ-পালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গাদির প্রতি যে অহিংস মনোভাব তা

জৈনদের গভীর পরিবেশ ভাবনাকেই প্রতিফলিত করে। বর্তমানযুগে এর গুরুত্ব যে কতখানি তা প্রমাণিত হয় সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে।

উপসংহার : জৈন নীতিতত্ত্ব অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে যে মূল নির্যাসটি অনায়াসেই গ্রহণ করা যায় তা হল এই যে, এই নীতিতত্ত্বে মানুষের উপর কঠোর নিয়ম নীতির ভার আদৌ চাপিয়ে দেওয়া হয় নি বরং কিভাবে অনৈতিক কর্মের ভার পরিহার করা যায় তার একটি দিক নির্দেশ করা হয়েছে। সংগ্রহের কৌশল নয় বরং গ্রহণের বিধিনিষেধেই এই নীতিতত্ত্ব সমুজ্জল। পরিশেষে বলা যায়, জৈন নীতিতত্ত্ব তৎকালীন সময়েও যেভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল, আজ এত বছর পরেও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বা আরও বেশী মাত্রায় প্রাসঙ্গিক বললেও হয় তো অত্যুক্তি হবে না।

আলোচনার যবনিকা টানার পূর্বে একথা বলতে বাধা নেই যে, ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকদের নৈতিকতার স্রোতে যেমন ভারতীয় সভ্যতার জীবনধারা প্রবাহিত, ভারতীয় সংস্কৃতির জাহ্নবীপ্রবাহ আজও গতিশীল, তেমনি নাস্তিক দার্শনিকদের বিশেষ করে জৈন দার্শনিকদের নীতিবোধ ভারতীয় জীবনদর্শনের পাপড়ি খুলে তাঁকে যেন উন্মুক্ত চিন্তাধারার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যা শিখিয়ে দিয়েছে নাস্তিক হোক বা আস্তিক নীতিবোধ যখন জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় তখন তা দর্শনেই জায়গা পায়। তাই বলা যায় যতদিন এ জগতের বুকে নীতিতত্ত্বের আলোচনা হবে ততদিন জৈন নীতিতত্ত্ব জায়গা করে নেবে মননশীল সাধকের সূক্ষ্ম মানসিকতায়।

তথ্যসূত্র :

[1] তত্ত্বার্থসূত্র, ২.৮
[2] তত্ত্বার্থসূত্র, ২.১০
[3] তত্ত্বার্থসূত্র, ২.১২
[4] তত্ত্বার্থসূত্র, ৫.১৭
[5] তত্ত্বার্থসূত্র, ৫.৩
[6] তত্ত্বার্থসূত্র, ৫.৫
[7] Stevenson, S., The Heart of Jainism, p. 107
[8] মণ্ডল, প্রদ্যোতকুমার, ভারতীয় দর্শন, পৃঃ ৬৮
[9] তত্ত্বার্থসূত্র, ৫.২৫
[10] তত্ত্বার্থসূত্র, ৫.১৯
[11] তত্ত্বার্থসূত্র, ৫.২০, Trans. Tatia Nathmal, P. 131
[12] তত্ত্বার্থসূত্র, ৬.১
[13] তত্ত্বার্থসূত্র, ৬.২
[14] Umasvati/Umasvami's, Tattvartha Sutra, That Which is, Trans. Tatia Nathmal, P. 152
[15] তত্ত্বার্থসূত্র, ৯.৭

গ্রন্থপঞ্জী

- মণ্ডল, প্রদ্যোতকুমার, (২০০৮), ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- মুনিজী, সুজয়, (২০০০), জৈনধর্ম ও শাসনাবলী, শ্রী অখিল ভারতীয় স্বারক জৈন সংগঠন।
- শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ, (১৩৮১), ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, জৈনভবন, কলকাতা।
- সান্যাল, ইন্দ্রাণী ও রত্না দত্ত শর্মা, (২০০৯), ধর্মনীতি ও শ্রুতি, সেন্টার অফ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
- সেন, অমুল্যচন্দ্র, (১৩৫৮), জৈনধর্ম, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, কলকাতা।
- Banerjee, Satyaranjan, (2002), Introducing Jainaism, Jain Bhawan.
- Bhargava, Dayanand, (1968), Jaina Ethics, Motilal Banarasidass.
- Samsookha, Puranchand, (1999), Essence of Jainism, Jain Bhawan.
- Stevenson, Sinclair, (1970), The Heart of Jainaism, Munshiram Monaharlal, New Delhi.